# রবীন্দ্রনাথ কি সাম্প্রদায়িক ছিলেন

মেজবাহ্উদ্দিন জওহের

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। কবিতা, গান, গীতিনাট্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, প্রহসন, রসরচনা, শিশুসাহিত্য- মোটকথা সাহিত্যের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে এই কালজয়ী লেখক তার জাদুকরী লেখনী হাতে বিচরণ করেননি। জীবৎকালেই তিনি বাঙালি জাতি তথা প্রাচ্যের গৌরব হিসেবে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি আদায় করে নেন। এই মনিষীর বিরুদ্ধেও হামেশা অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে তিনি মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে একশ্রেনীর লোক আছে যাদের প্যাসনই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে তার সাহিকর্মকে মুসলমান সমাজে অপাংতেয় করে রাখা। রবীন্দ্র সংগীতের বিরুদ্ধে কথা বলা কিংবা স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে তার একটি গানকে গ্রহন করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এই মানসিকতারই প্রতিফলন।
রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধবাদীদের দাবীর পেছনে আদৌ কোন যুক্তি আছে কি ? আসলেই কি তিনি মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন ? মুসলমান ধর্ম তথা ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তার কী ধারণা ছিলো? তার উপন্যাস ছোটগল্প তথা গদ্যসাহিত্যের নিরীখে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির জবাব খুজাই বক্ষমান প্রবন্ধের মুল উদ্দেশ্য।

প্রচলিত অর্থে সাম্প্রদায়িকতা বলতে বুঝায় অন্য ধর্ম বা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ। বিচারহীন গোঁড়ামী ও নিজ ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য সাম্প্রদায়িকতার মুল কারণ। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সমাজে যত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে , অন্যকোন কারনে এর এক শতাংশও হয়নি। যদিও সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি ব্যপক অর্থ বহন করে- আমাদের উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে বিচার করতে গেলে সাম্প্রদায়িকতা বলতে শুধুমাত্র হিন্দু ও মুসলমান - এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক হানাহানিকে বুঝালে অন্যায় হবে না। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় এই উপমহাদেশে যতো রক্ত ঝরেছে, অন্যকোন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। অত্র প্রবন্ধে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটিকে আমরা এই সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করব।
সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে পারে। সামাজিক আচরণে, রাজনীতিতে, শিল্পে, সাহিত্যে, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে - নানাভাবে। তবে এসব প্রকাশমাধ্যমগুলির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর মাধ্যমটি বোধ হয় সাহিত্য। কারন সাহিত্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে, এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্মে সংক্রামিত হয়ে মানব সমাজকে কলুষিত করে। রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত "গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস"-এর ক্ষত শুকিয়ে গেছে, কিন্তু সাহিত্যসম্রাট বংকিমচন্দ্রের রাজসিংহ-সীতারাম-আনন্দমঠ প্রভৃতি গ্রন্থে রোপিত উগ্র মুসলমান বিদ্বেষ আজও বাংলার মুসলমান সমাজের বুকে রক্ত ঝরায়। বাঙালি মুসলমান সমাজের একটি বিশেষ মহল অনেক কাল ধরে প্রচার করে আসছে যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাম্প্রদায়িক ছিলেন। বংকিমের মতো স্থুলভাবে না হলেও তার সাহিত্যে নাকি অতি সূক্ষ্যভাবে মুসলমান বিদ্বেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অভিযোগটি গুরুতর। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্য তথা উপন্যাস ও ছোটগল্পের আলোকে উক্ত অভিযোগটির সত্যাসত্য যাঁচাই করাই বক্ষমান প্রবন্ধের মুল উদ্দেশ্য।

## (ক) উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সংখ্যা মোট বারোটি- নৌকাডুবি, শেষের কবিতা, যোগাযোগ, দুই বোন, মালঞ্চ, চতুরংগ, চার অধ্যায়, বৌ-ঠাকুরাণীর হাট, গোরা, ঘরে বাইরে, চোখের বালি ও রাজর্ষি। এদের মধ্যে বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি উপন্যাসদ্বয় ইতিহাস ভিত্তিক কাহিনী আশ্রয় করে রচিত হয়েছে, বাদবাকী সবগুলিই সামাজিক। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসগুলিতে মুসলমান চরিত্রের সংখ্যা খুবই কম। এর কারণ বোধ হয় এই যে জন্মগতভাবে বিধাতা যে স্থানটি তাকে দিয়েছিলেন তা ছিল গ্রামবংলার সাধারন মুসলমান সমাজ থেকে লক্ষ যোজন দুরে। কে না জানে যে অত্যন্ত কাছ থেকে না দেখলে কোন কালোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনা করা যায় না, সার্থক সাহিত্য রচনা করতে হলে 'জীবনে জীবন যোগ' করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন কালোত্তীর্ণ সাহিত্যিকের পক্ষে এমন বিষয়ে লেখনী ধারণ করা সম্ভব ছিল না যে বিষয়ে তার জ্ঞান ছিলো নিতান্তই ভাসা ভাসা। এই কারনেই বোধ হয় তার সাহিত্যকর্মে মুসলমান পাত্রপাত্রীর সংখ্যা এত নগন্য।

প্রসংগক্রমে আরেকটি কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। সূক্ষ্য সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ ছাড়াও সমালোচকরা তার বিরুদ্ধে আর যে অভিযোগটি নিয়ে আসেন তা হলো --রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের কবি ছিলেন না। তার সাহিত্য সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেনী তথা রাজা-মহারাজা ও জমিদার শ্রেনীর নরনারীদেরকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশে সত্য। 'শাস্তি' গল্পের ছিদাম রুই আর দুঃখীরাম রুইদের মতো চরিত্র রবীন্দ্র সাহিত্যে এসেছে সত্য, তবে এ ধরণের রচনার সংখ্যা নিতান্তই নগন্য। জন্মসূত্রে বিধাতা তাকে যে স্থানটিতে রোপন করেছিলেন, সে সীমানাপ্রাচীর অতিক্রম করে সমাজের নীচু শ্রেনী অর্থাৎ চাষী, কামার, কুমোর, জেলেদের সমাজে তিনি বিচরণ করার সুযোগ পাননি। এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন। 'ঐকতান' কবিতায় এ সম্পর্কে তার বক্তব্য নিম্নরূপ-

"চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল
তাঁতী বসে জাল বুনে, জেলে বুনে জাল
বহুদুর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাংগনের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিলো না একেবারে
জীবনে জীবন যোগ করা-
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি
গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণীর লাগি কান পেতে আছি'।

নিজের লেখায় সাধারণ মানুষের অপ্রতুলতা সম্পর্কে এই হলো কবির অকপট উপলব্ধি ও জবাবদিহীতা। রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলমান পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা নগন্য- একথা সত্য। তবে যতো নগন্যই হোক, যিনি সার্থক শিল্পী, বিষয় সম্পর্কে তার কী ধারণা তা তার তুলির দু'একটি আঁচড় হতেই বুঝে নেয়া যায়।

আমরা প্রথমে বৌ-ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসটি আলোচনায় আনবো। যশোররাজ প্রতাপাদিত্য ঘোর মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন। মুসলমানদিগকে তিনি 'নেড়ে', 'ম্লেচ্ছ', 'যবন' প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্বেষমুলক বিশেষণে বিভুষিত করতেন। দিল্লীর মুগলসম্রাট ছিল তার চক্ষুশুল। এই ম্লেচ্ছরাজকে অপসারণ করে ভারতে হিন্দুরাজ কায়েম করাই ছিল প্রতাপাদিত্যের জীবনের স্বপ্ন। প্রতাপাদিত্যের ভাষায় -"এই ম্লেচ্ছরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন ধর্ম, আর্য্য ধর্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। ক্ষত্রিয়েরা মোঘলকে কন্যা দিতেছে, হিন্দুদের আচারভ্রষ্ট করিতেছে, এই ম্লেচ্ছদের আমি দুর করিয়া দিব...। যাহারা যবনের মিত্র তাহাদের বিনাশ না করিলে ইহা সিদ্ধ হইবেনা"। প্রতাপাদিত্য উগ্র হিন্দুত্বের প্রতীক, সুতরাং চরম সাম্প্রদায়িক। যা কিছু উদার, যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, তা ধ্বংস করাই ছিল প্রতাপাদিত্যের জীবনের প্রধান সুখ। তিনি হলেন উপন্যাসের খলনায়ক, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিমত এখানে প্রণিধানযোগ্য- "তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিলীশ্বরকে উপেক্ষা করার মত অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্ব তার ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না"।

পক্ষান্তরে বসন্তরায়, উদয়াদিত্য, সুরমা, বিভা প্রভৃতি নট-নটীগন কোন ইতিহাসজাত চরিত্র নয়, তারা রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের প্রিয় সৃষ্টি। অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবপ্রেম তাদের জীবনের মুলমন্ত্র, সুতরাং দুর্জন প্রতাপাদিত্যের কাছে তারা বধযোগ্য। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসে দু'একটি ছোটখাট মুসলমান চরিত্র আছে, এর প্রতিটি চরিত্র স্বমহিমায় উজ্জ্বল। হোসেন খাঁ ঘাতক, নিরপরাধ বসন্ত রায়কে বধ করতে এসে তার উক্তি- "যদিও রাজার আদেশ, তথাপী এমন কাজে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। কারন

আমাদের কবি বলেন- রাজার আদেশে প্রভুর আদেশে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে পার। কিন্তু সাবধান, স্বর্গের এক কোনও ধ্বংস করিও না"। প্রতাপাদিত্যের পাঠান সেনাপতি মুক্তিয়ার খাঁ আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ঠুর। অথচ এই নিষ্ঠুর সৈনিকটির ভেতরে একটি স্নেহপ্রবন কোমল মন আছে যার পরিচয় পাওয়া যায় বসন্ত রায়কে হত্যার সময়। রাজার আদেশ পালন করতে সেনাপতি বাধ্য, তবুও এই অন্যায় হত্যা করতে তার ভেতরের মানব-হৃদয় কেঁদে উঠেছে, চোখে জল এসেছে। হত্যার পুর্বে বসন্ত রায়ের পা ছুয়ে তার মার্জনা ভিক্ষা করেছে।

রাজর্ষি রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস। ত্রিপুরার চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দমাণিক্য এই উপন্যাসের নায়ক। উপন্যাসটির মুল উপজীব্য হচ্ছে- "প্রেমের অহিংস পুজার সংগে হিংস্র শক্তি পুজার বিরোধ"। উপন্যাসের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অবশেষে প্রেমের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিংস্র শক্তি পুজা তথা মা কালীর পুজারী রঘুপতির অবশেষে এই উপলব্ধি হয়েছে যে- 'মন্দিরের ভেতরকার অলস অবচেতন অকর্মণ্য' স্থুল পাষান মুর্তিগুলি মিথ্যা, প্রকৃত সত্য হচ্ছে প্রেম ও ভালোবাসাপুর্ণ জীবন্ত মানব হৃদয়। উপন্যাসের শেষ অংশে মুঘল শাহজাদা শাহ সুজার একটি চরিত্র আছে- যিনি আপন ভাইয়ের সাম্রাজ্যলিপ্সার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পরিবার পরিজনসহ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ সুজাকে কাহিনীতে এনেছেন খুব সম্ভবত এটা প্রমান করতে যে একজন রাজা নিজের রাজত্ব স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে মনের সন্তোষে বৈরাগ্য গ্রহন করেছেন- পক্ষান্তরে একজন রাজা ঘটনার অনিবার্য্য পরিণতিতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনন্যোপায় হয়ে বৈরাগ্য গ্রহন করেছেন। এই দুই রাজার মধ্যে যে প্রভেদ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা নিম্নরূপ- শাজ সুজা "আপনার কামনা বাসনা বিসর্জন দিয়া স্বাধীন ও সুস্থ হইয়া জগতের কাজ করিতে বাহির হইয়াছেন তাহা নহে; এ কেবল আপন বাসনা তৃপ্তি হয় নাই বলিয়া রাগ করিয়া সমস্ত জগতের উপর প্রতি বিমুখ হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যাহা চান তাহাই তার পাওনা এইরূপ তাহার বিশ্বাস- জগত তাহার নিকট যাহা চায় তাহা সুবিধামত দিলেই চলিবে এবং না দিলেও কোন ক্ষতি নাই ঠিক এই বিশ্বাস অনুসারে কাজ হয় নাই বলিয়া তিনি জগতকে একঘরে করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন"। পক্ষান্তরে গোবিন্দমাণিক্যও "সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, তবুও সমস্তই যেন তাহারই। তিনি কিছুই চান না বলিয়া যেন পাইয়াছেন- তিনি আপনাকে দিয়াছেন বলিয়া সমস্ত জগত আপন ইচ্ছায় তাহার নিকট ধরা দিয়াছে"। তবে উগ্র সাম্রাজ্যলিপ্সার শিকার ভাগ্যবিড়ম্বিত শাহসুজার প্রতি রবীন্দ্রনাথের একাট প্রচ্ছন্ন সহানুভুতি লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দমাণিক্য কতৃক কুমিল্লায় শাহ-সুজা মসজিদ নির্মান এই সহানুভুতিরই ইংগিতবাহী।

গোরা রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়- গোরা উপন্যাসটি রবীন্দ্র দর্শনের নির্য্যাস স্বরূপ। রবীন্দ্র দর্শন এই উপন্যাসটিতে মুর্ত রূপ ধারণ করেছে। হিন্দু ও ব্রাম্ম ধর্মের সংঘাতের মধ্য দিয়ে ঘটনা আবর্তিত হয়ে অবশেষে এই চরম সত্যের উপলব্ধি ঘটানো হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতা বা ধমীয় গোড়ামি মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর পেছনে সত্য নেই। উপন্যাসের নায়ক উগ্র হিন্দুত্বের প্রতীক গোরা নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অবশেষে ধর্মান্ধতার অসারতা বুঝতে পেরেছে, জ্ঞানবৃদ্ধ পরেশ বাবুকে বলেছে- "আপনি আজ আমাকে সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেরই- যার মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোন দিন অবরুদ্ধ হয় না"।
গোরা উপন্যাসটি যেহেতু সাম্প্রদায়িক সংঘাত নিয়ে রচিত, সুতরাং এর মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (বিশেষ করে হিন্দু ও ব্রাম্ম) মধ্যে প্রচলিত নানাপ্রকার আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার-কুসংস্কারের বিষয় এসেছে। মুসলমান ধর্ম ও মুসলিম সম্প্রদায়ও মাঝে মাঝে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের প্রতি অবমাননাকর একটি উক্তিও কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। বরং প্রত্যন্ত গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনা করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকতর সাহসী ও প্রতিবাদী হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। যেমন একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম সম্পর্কে লিখেছেন- "অন্য সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে, কেবল এই চর-ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবেরা শাসন করিয়া বাধ্য করিতে পারে নাই। এখানকার প্রজারা সকলেই মুসলমান এবং ইহাদের প্রধান ফরু সর্দ্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষে দুইবার পুলিশকে ঠেংগাইয়া সে জেল খাটিয়াছে; তাহার অবস্থা এমন যে তাহার ঘরে ভাত নাই বলিলেই হয়; কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না"।

হিন্দু ও মুসলমান এই দুই নিকট প্রতিবেশী সম্প্রদায় ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে আবহমান কাল ধরে বসবাস করে আসছে। এই দুই ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আত্মজিজ্ঞাসা গোরা উপন্যাসে নিম্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে-----

***হিন্দু ধর্ম:** "যে ধর্ম সেবারূপে, প্রেমরূপে, করুণারূপে, আত্মত্যাগরূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রেরণা দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাকে দেখা যায় না। যে আচার কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিকে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দুরে খেদাইয়া রাখে তাহাই সকলকে সকল বিষয়ে কেবল বাঁধা দিতে থাকে"।

***মুসলমান ধর্ম:** "মুসলমানদের মধ্যে সেই জিনিষটি আছে যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে এক করিয়া দাড় করানো যায়।--- ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নহে। একদিকে যেমন আচারের বন্ধন তাহাদের সমস্ত কাজকর্মকে বাঁধিয়া রাখে নাই, অন্যদিকে তেমনি ধর্মের বন্ধন তাহাদের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ট। তাহারা সকলে মিলিয়া এমন একটি জিনিসকে গ্রহন করিয়াছে, যাহা 'না' মাত্র নহে, যাহা 'হা'; যাহা ঋনাত্মক নহে যাহা ধনাত্মক; যাহার জন্যে মানুষ এক আহ্বানে এক মুহূর্তে একসংগে দাড়াইয়া অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে"।

ঘরে বাইরে উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। উপন্যাসটি স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন তথা বংকিমের 'বন্দে মাতরম' শ্লোগানকে গ্রহন করতে পারেননি বলে তৎকালীন হিন্দু সমাজে যথেষ্ট সমালোচনা ও লাঞ্ছনার শিকার হন। সম্ভবত তারই জবাবে তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেন। 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান গ্রহন করতে না পারা সম্পর্কে উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশের জবানীতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য- "দেশকে আমি সেবা করতে রাজী আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে"।

স্বদেশী আন্দোলনের বিকৃতি দেখে রবীন্দ্রনাথ তার থেকে নিজকে দুরে সরিয়ে রাখেন। নিখিলেশের জবানীতে তিনি বলেছেন- বিমল "ভেতরে ভেতরে আমার উপর রাগ করে উঠেছে যখন দেখছে আমি বন্দে মাতরং হেকে চারিদিকে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াইনে। আজ সমস্ত দেশের ভৈরবী চক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাইনি এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে আমি খেতাব চাই কিংবা পুলিশকে ভয় করি। পুলিশ ভাবছে ভেতরে ভেতরে আমার কু মতলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভাল মানুষ। তবু আমি এই অপমানের পথ ধরেই চলছি"।

উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান সংঘাতের কথা আছে। স্বদেশী আন্দোলনের বিকৃতি কীভাবে নিরীহ প্রজাদের বিশেষ করে দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের নিষ্পেষিত করেছে সত্যসন্ধ রবীন্দ্রনাথ সে কথা ভুলেননি। সন্দীপের আত্মকথায় দেখা যায়- "কুন্ডুদের গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুরী টাকা আদায় করতে বেরিয়েছিল। একটা মুসলমান প্রজার বেচে কিনে দেবার মত কিছু ছিল না। ছিল তার যুবতী স্ত্রী। ভাদুরি বললেন- তোর বউকে দিয়ে টাকা শোধ করতে হবে। নিকে করার উমেদারও জুটে গেল, টাকাও শোধ হল। আপনাকে বলছি, স্বামীটার চোখের জল দেখে রাতে আমার ঘুম হয়নি"।

গো-হত্যা নিয়ে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানে বিস্তর রক্তপাত ঘটেছে। গোড়া হিন্দুদের মত- শুধু ধর্মের দিক বিবেচনা করেই নয়, প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করলেও ভারতবর্ষে গো-হত্যা করা উচিৎ নয়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। গরুই কৃষিকাজের মুল উপকরণ, সুতরাং ভারতবর্ষে গো-হত্যা অনৈতিক। এর উত্তরে ঘরে বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশের জবানীতে রবীন্দ্রনাথ বলেন- "কৃষিকাজের জন্যে গরুর মত মহিষও সমানভাবে উপকারী। অথচ মহিষ হত্যা করা অবৈধ নয়। (বরং কালীপুজার সময় ১০১ টা মহিষ বলি দিয়ে পুরোহিতরা আনন্দে নৃত্য করে)। এর অর্থ এই যে গো-হত্যা না করা কোন ধর্মের বিধান হতে পারে না- এটা একটা আচার মাত্র"।

বৃটিশ আমলে মুসলমানদের অবস্থা সাধারণভাবে শোচনীয় ছিল। সুদীর্ঘ্য দুইশত বৎসর আধুনিক শিক্ষা তথা ইংরেজী শিক্ষা থেকে দুরে থাকার কারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পরে তারা। মুসলমান সম্প্রদায়ের সিংহভাগই ছিল অবহেলিত ও চরম দরিদ্র কৃষক, মজুর, চামার ইত্যাদি শ্রমিক শ্রেনীর। এই অবহেলিত সম্প্রদায়কে গোঁড়া হিন্দুরা প্রচন্ড ঘৃনা করত এবং অস্পৃশ্য বলে দুরে সরিয়ে রাখত যা রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণে আঘাত করে। তিনি যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই গোঁড়া হিন্দুদের এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উন্মোচন করেছেন এবং শোষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি তার করুণা ও সহানুভূতি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। চতুরংগ উপন্যাসের জ্যাঠামশাই চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য

সৃষ্টি। বস্তুতঃ শেষের কবিতার অমিত চরিত্র ছাড়া এমন একটি চরিত্র রবীন্দ্র সাহিত্যেও বিরল। চতুরংগ উপন্যাসের রত্ন এই জ্যাঠামশাইর চোখে কোন জাতিভেদ নেই, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বালাই নেই। দরিদ্রের সেবাই তার ধর্ম, সে দরিদ্র যদি নীচু অন্ত্যজ মুসলমান চামার হয় তবুও সে দেবতা, দরিদ্র নারায়ন। তথাকথিত উঁচুশ্রেনীর গোঁড়া হিন্দুদের সাথে তাই তার পদে পদে বিরোধ বাধে। জ্যাঠামশাই গরীব মুসলমান চামারদের ভোগের আয়োজন করেছেন। তার ছোটভাই গোঁড়া হিন্দু হরিমোহনের তাতে বিষম আপত্তি। সে জ্যাঠামশাইকে নিষেধ করলে জ্যাঠামশাই উত্তর দেন- "তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না। আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব, ইহাতে বাঁধা দিও না"।
"তোমার ঠাকুর"!
"হ্যা আমার ঠাকুর"।
"তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা"?
"হ্যা, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোন দেবতা তাহা পারে না"।
মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতার এর চেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে?

## (খ) ছোট গল্প

ছোট গল্প রবীন্দ্র সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ ভান্ডার। এমন শিল্পমন্ডিত স্বার্থক গল্পসম্ভার বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নাই ছোট গল্পের মূল উপজীব্য। গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত-অপ্রচলিত গল্পের সংখ্যা মোট ৯৫টি। এদের মধ্যে রীতিমত নভেল, দুরাশা ও মুসলমানীর গল্প- এই গল্প তিনটি ছাড়া অন্যকোন গল্পে মুসলমান চরিত্র বড় একটা নাই। কাবুলিওয়ালা ও মুকুট গল্পে রহমত ও সেনাপতি ঈশা খাঁকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে চিত্রায়িত করেছেন বাঙালি পাঠক মাত্রই তা জানেন। এস্থলে তার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। রীতিমত নভেল গল্পটিতে মূল গল্পের পটভূমি হিসেবে "আল্লাহু আকবার" ও "হর হর বোম্ বোম্" ধ্বনি প্রদানকারী যবন ও হিন্দু সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের একটি কাল্পনিক বর্ননা দেয়া হয়েছে মাত্র। মুলতঃ গল্পটিতে মুসলমান চরিত্র ও মুসলমান ধর্ম সংক্রান্ত কোন বিষয় না থাকাতে এটিকেও আলোচনার বাইরে রাখা যায়। বাকী রইল শুধু দুরাশা ও মুসলমানীর গল্প। সাম্প্রদায়িকতার নিরীখে এই গল্প দু'টিকে পর্য্যালোচনা করে দেখা যাক এবার।
দুরাশা গল্পটি রবীন্দ্রনাথের কংকাল, ক্ষুধিত পাষাণ কিংবা মাষ্টার মশাই গল্পগুলির ন্যায় কিছুটা অতিপ্রাকৃতিক। দার্জিলিংয়ের শৈল শিখরে কুয়াশা ঘেরা অতি-প্রাকৃত পরিবেশে লেখকের সংগে এক ক্রন্দনরতা রমণীর সাক্ষাৎ হয় যে নিজেকে বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাঁদের খাঁ'র কন্যা বলে পরিচয় দিল। যৌবনকালে সে সিপাহী বিদ্রোহের বীর সেনানী কেশরলাল নামক এক ব্রাহ্মণের প্রেমে পড়ে ঘর ছাড়ে। এই প্রেম নিতান্তই একতরফা এবং দেহ বিবর্জিত প্রেম। কেশরলাল তার ব্রাহ্মণত্বের অহংকারে এক যবন কন্যাকে গ্রহন করতে অস্বীকার করে। তবুও কেশরলালের বীরত্ব, স্বধর্মনিষ্ঠা ও অবিচলিত আদর্শের প্রতি মোহাচ্ছন্ন নবাবযাদী তাকে এক তরফাভাবে ভালোবাসতে থাকে। অবশেষে সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হয় এবং কেশরলাল নিখোজ হয়। নবাবকন্যার ধারণা ছিল তার প্রেমাস্পদ কেশরলাল দেশমাতৃকার জন্যে জীবন দিয়েছে। একনিষ্ঠ প্রেমের অহংকারে নবাবকন্যা আর কোন পুরুষকে গ্রহন না করে কেশরলালের স্মৃতি নিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। অবশেষে জীবনসায়াহ্নে উপস্থিত হয়ে নবাবকন্যার মোহভংগ ঘটে। একদিন সে দেখতে পায় -তার স্বপ্নের পুরুষ কেশরলাল এক ভুটিয়া পল্লীতে পুত্র-পৌত্রাদি সহকারে বসবাস করছে এবং ভূট্টা খেত হতে ভূট্টা সংগ্রহ করছে! নবাবজাদীর সারাটি জীবন এক মিথ্যা মোহের খপ্পড়ে পড়ে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই গল্পে একনিষ্ঠ প্রেমের পুজারি নবাবজাদীর ট্র্যাজেডী পাঠকের মনকে স্পর্শ করে এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলে। পক্ষান্তরে জ্যাত্যাভিমানী আদর্শভ্রষ্ট কেশরলালের প্রতি পাঠকের মন বিমুখ হয়ে উঠে।
মুসলমানীর গল্পটি বলতে গেলে দুরাশা গল্পের বিপরীত মেরুর গল্প। কমলা ছিল হিন্দু ঘরের এক অপুর্ব সুন্দরী যুবতী। বিয়ের পর স্বামীর ঘরে যাওয়ার সময় বরযাত্রীগন দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। বরযাত্রীগন কনেকে ফেলে প্রাণ নিয়ে পালায়। দস্যুরা যখন কমলাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে, তখন হবির খাঁ নামক এক সদাশয় মুসলমান বাঁধা দেয় এবং ডাকাতদের হাত থেকে কমলাকে উদ্ধার করে। হবির খাঁ কমলাকে বলে- "বুঝেছি তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ- যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দু বাড়ীর মেয়ের মতই থাকবে"।

কমলা হবির খাঁ'র বাড়ীতে আশ্রয় পায়। সেখানে সে সমস্ত হিন্দু আচার অনুষ্ঠান পালন করে এমনকি শিবপুজা পর্য্যন্ত করে হিন্দুমতে জীবন যাপন করতে থাকে। কমলার কোন দোষ না থাকা সত্বেও গোঁড়া ও কূপমন্ডুক হিন্দু সমাজ কমলাকে আর গ্রহন করে না, নিষ্ঠুরভাবে তাকে ফিরিয়ে দেয়। অবশেষে হবির খাঁ'র ছেলে করিমের সাথে তার প্রেম হয়। কমলার মনের পরিবর্তন হবির খাঁ'র সাথে তার কথোপকথনে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে- "বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনদিন দেখতে পেলাম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে কথা আমি আজও ভুলতে পারি না। আমি প্রথম ভালবাসা পেলাম, বাপজান তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও প্রাণের মুল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজা করি, তিনিই আমার দেবতা। তিনি হিন্দুও নন্, মুসলমানও নন্। তোমার মেজ ছেলে করিম, তাঁকে আমি মনের মধ্যে গ্রহন করেছি- আমার ধর্ম কর্ম ওরই সংগে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না..."।

বস্তুতঃ 'মুসলমানীর গল্প' গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ তৎকালিন হিন্দু সমাজের কূপমন্ডুকতা, ভীরুতা, আচার-সর্বস্বতা ইত্যাদির বিপরীতে মুসলমান সমাজের উদারতা ও পর ধর্মমত সহিষ্ণুতা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

## (গ) উপসংহার:

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোট গল্পে সাম্প্রদায়িকতা তথা মুসলমান বিদ্বেষ কতটুকু আছে উপরের আলোচনা হতে আশা করি পাঠকের কাছে তা পরিস্কার হয়ে যাবে। ব্রাম্মসমাজভুক্ত হলেও চিন্তা চেতনায় যে ধর্মকে তিনি আজীবন অনুসরন করেছেন, সেটি হচ্ছে মানবধর্ম। সেই ধর্মে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টানে কোন ভেদ নেই। মানুষ সমস্ত জাত-পাতের উর্দ্ধে- এই উপলব্ধিই রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল সুর। গোরা উপন্যাসের উপসংহারে গোরার মুখে আমরা শুনতে পাই- "আমি যা দিন রাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন"।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পুর্ন থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ্য জীবৎকালে কিছু সময় তিনি গোঁড়া হিন্দুত্বের দিকে ঝুকেছিলেন। এই সময়ের ব্যাপ্তি অবশ্য খুব বেশী নয়- চার কি পাঁচ বছর মাত্র। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম কয়েকটি বছরে তিনি এমন কিছু অ-রাবীন্দ্রিক প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেন যার মধ্যে তার এই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'নববর্ষ', 'ব্রাম্মণ', 'মা ভৈঃ' প্রভৃতি প্রবন্ধ কিংবা 'শিবাজী উৎসব' জাতীয় কবিতার নাম উল্লেখ করা যায়। এর কোনটিতে তিনি হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, কোনটিতে ব্রাম্মণত্বের মহিমা কীর্তণ, কোনটিতে প্রাচীন ভারতের সহমরণ ব্যবস্থায় হিন্দু সতী নারীর অসাধারণ পতিপ্রেমের বন্দনা করেছেন। তবে বছর কয়েকের মধ্যেই তার এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী চেতনার অপমৃত্যু ঘটে। ভবিষ্যতে যে কবি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী কবি রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন, তার জন্যে এই চার পাঁচ বছর সময় অবশ্য মোটেও কম সময় নয়।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নেড়ে, যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি উপহাসমূলক শব্দগুচ্ছ রয়েছে, কিংবা কবিতায় 'দয়া করে বিধি জন্ম দিয়েছেন নীচু যবনের ঘরে'- এই জাতীয় পংতি রয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক- এইরূপ যুক্তি নিতান্তই হাস্যকর। বিশাল রবীন্দ্র সাহিত্য পুরোপুরি অনুধাবন না করে খন্ডিতভাবে বিচার করলে ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, বরং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার দেয়াল তুলে যারা বিশ্বমানবতা ও ঈশ্বরপ্রেমে ভরপুর অনাবিল রবিরশ্মিকে বাঁধ দিয়ে রাখতে চান, ক্ষতি তাদেরই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

"দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি
সত্য বলে আমি তবে কোন পথে ঢুকি"।